তৃতীয় পৃথিবীর বিহরণ ও একজন প্রত্যক্ষ বাস্তবের দ্রষ্টা

জলধি হালদার

মণিদা। মণিভূষণ ভট্টাচার্য। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড নামের ছোট্ট,মফস্‌সল শহরের পণ্ডিত বাড়ির ধার্মিক জলবায়ুর মানুষ। হাতে গোনা যে কয়েকজন কবি বাংলা কবিতার গর্ব—চল্লিশ বছর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলেন 'আমরা মৃত্যুর কথা বলি না কখনো'। এবং তিনি এত বেশি নিরন্ন আকাশে স্বপ্ন দেখেছেন যে, কোনও অর্থেই অস্পষ্ট ছিলেন না। সেই নিরন্ন আকাশের স্বপ্ন মুক্তধারার প্লাবনে ডালপালা মেলেছে গত শতাব্দীর শেষ চল্লিশটি ও দুহাজারের প্রথম দশক জুড়ে। যা বাস্তবের মাটিতে অংকুরিত হয়ে চলে গেছে মহিরূহের অসংখ্য পাতাপল্লবে।

কী ছিল তাঁর স্বপ্নের রঙ! উনিশশো অষ্টআশিতে মাণিদার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে দেওয়া সাক্ষাৎকারের রঙটি মেদহীন ও আমাদানিকৃত ন্যাকামিবর্জিত। ১—'সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক যন্ত্রণাময় জীবন ও সংগ্রামের উপাদানেই আমার কবিতার তত্ত্ববিশ্ব রচিত হয়েছে।' (এবং এই সময় এপ্রিল-জুন ১৯৮৮)। ২—'আমি কমিটমেন্টে বিশ্বাস করি। প্রত্যেকটি লোকই কমিটমেন্টে বিশ্বাস করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কমিটমেন্টটা কোন্ দিকে? শাসক শ্রেণির দিকে, না শোষিত শ্রেণির দিকে? ...আমি নিপীড়িতদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি এবং তাঁদের কথা ভেবেই লিখি। সুতরাং তাঁদের প্রতিই আমার কমিটমেন্ট।' (রৈবতক, জুন, ১৯৮৮)। ৩—'(আমার কবিতায়) শ্রেণি সচেতনতা এসেছে পঞ্চাশের দশকেই অর্থাৎ যখন লিখতে শুরু পরি। এখনও তা অটুট আছে। তবে কবিতার অঙ্গিকের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মূল বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনাও নেই।' (নবান্ন বসন্ত সংখ্যা, ১৯৮৮)।

এই সাক্ষাৎকারগুলি থেকে মণিভূষণের কবিতার বিহরণ ও সংলগ্নতা জলের মতো সোজা ও একনিষ্ঠ তর্জনীনির্দেশের বিজন বৃষ্টি। ফেলে আসা চালচিত্র উলটে দেখলে কবির সামাজিক ও রাজনৈতিক মনোভঙ্গির গড়ন ধরা দেবে। বারো বছর বয়সে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে চলে আসেন আসানসোলে। রেলে চাকরি করতেন বড়দা। সেখানে ধর্মীয় ঘেরাটোপের বদলে রেলশ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামী মানুষদের মুখোমুখি হন। সেখানে দুর্গাপুজোর বইয়ের স্টল থেকে দুআনায় 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' কিনে পড়েছিলেন। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর উচ্চ শ্রেণির পঠনের কাল। তখন চল্লিশ দশকের উত্তাল দিনগুলির আঁচ নিভে গেছে। গণনাট্য আন্দোলনের শৈল্পিক প্রত্যয় বেশ দুর্বল। সদ্য স্বাধীন দেশের মাঠেঘাটে 'সারে জঁহা সে আচ্ছা' বাজছে তুমুল। সিনেমাগৃহে ছবি শুরু হওয়ার আগে ফিল্ম ডিভিশন সবুজ ধানের খেত দেখাচ্ছে

রোজ। যেন বলছে, তুমি আর কিছু দেখতে, জানতে, বুঝতে চেয়ো না। 'ভারত আবার জগৎ সভায়...' বাংলা কবিতায় আত্মস্বীকারোক্তি ও আত্মজৈবনিক ধারা মাথা ঝাঁকাচ্ছে। অন্যদিকে ছাত্রদের মধ্যে বামপন্থী দর্শন চারিয়ে যাচ্ছে দশ দিগন্ত জুড়ে। বামপন্থী না-হলে কলেজের মেয়েরাও পাত্তা দিত না। সীতাকুণ্ডের তন্ত্রসাধক ও বাচস্পতি যোগেন্দ্রনাথ মহাশয়ের ছোটো ছেলে বামাদর্শে একনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। যে আদর্শে সারাজীবন অটল থাকবেন। আজকের এই বিশ্বায়নের ধুরন্ধর কৌশলের শোষণে মানুষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তখনও সে আদর্শ প্রয়োগযোগ্যভাবে অব্যর্থ প্রতিষেধকের কাজ করে। যিনি লিখবেন বাংলা কাব্যসাহিত্যের নক্ষত্র বই 'গান্ধীনগরে রাত্রি'। যাঁরা এই আদর্শকে কখনও দলীয় অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করেন নি, সেই কয়েকজন বিরল ব্যক্তিদের একজন হবেন। এবং বাংলা কবিতার ক্লীবতা দোষের ভূত ঝাড়াবেন।

উনিশশো বাষট্টিতে 'কবিপত্র' থেকে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের তদারকে নৈহাটির কিছু বন্ধুদের সক্রিয়তায় পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' প্রকাশিত হয়েছিল। ষাটের দিনগুলিতে কবিতার নতুন ভাষা ও ভাষ্য নিয়ে হইচই, হাংরিদের যৌনতা নিয়ে কিছুটা হলেও অপরিণত কর্মকাণ্ড, কবিতার নদী ষাঁড়াষাড়ির বান নিয়ে ঢুকে পড়েছে খালাসিটোলায় বারদুয়ারির ভাসানে। তার মধ্যেই অন্য রকম কবিতা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন মণিভূষণ এবং কোনও অর্থে অস্পষ্ট নয়। এই স্পষ্টতা সাবলীলভাবে ছড়িয়ে গেছে কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ অবধি। এমন সূত্রপাত থেকে পরে লক্ষ্যিত হবে হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ার মতো ব্ল্যাক হিউমার। যা বাংলা কবিতায় বেশ দুর্লভ। আসবে তৎসম শব্দপ্রয়োগ কিছুটা সুধীন্দ্র ঘরানা। বিক্ষয়ের গুরুত্বে শানিত তরবারির মতো কবিতা। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রকবিতা দু-একটা লাইন উচ্চমাত্রার ভরবীতে নিয়ে যাবে। মুগ্ধ হয়ে পড়া গেল—'আমরা এখনো আছি আলো আর আকাশের দেশে। / বসন্তে বর্ষায় শীতে পুরোনো গল্পের নব্য শ্রোতা, / সুখ দুঃখ বিরহের পদাবলি গাঢ় ভালোবেসে / ...কয়েকটি উজ্জ্বল মুখ পরস্পর ডেকে বলি, শোনো— / আমরা মৃত্যুর কথা বলি না কখনো।' তাছাড়া 'অভিজ্ঞান বসন্ত', 'বার্ধক্যের দেশে', 'বড়োদিনের ছুটিতে', 'পোশাক' 'সেলুন', 'প্রহরী' কবিতাগুলি পাঠের পর বোঝা যায় কবি অন্ধকার থেকে আলোর পথ ছিল অন্বিষ্ট। চিনতে পেরেছিলেন সভ্যতা ও সমাজের নগ্ন সত্য, যা কুৎসিত এবং কুৎসিত। অনেক প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও পথ ভুল করেন নি। ভারতীয় রাজনৈতিক প্রশাসকদের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলেছেন বারবার। কখনও মেনে নিতে পারেন নি দেশভাগ। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'মাউন্টব্যাটেন-নেহরু-জিন্নার রাজনৈতিক দাবাখেলার ফল দেশবিভাগ। কোনোদিন এই ত্রিখণ্ডিত উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের বিচ্ছিন্ন হৃদয়কে আমি ভুলতে পারিনি। (মহাযান, জানুয়ারি ১৯৯৫)

তাঁর তৎসম শব্দের আকর্ষণ বুঝতে যেতে হবে আরও ন'বছর পরে প্রকাশিত 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'তে। 'মহালয়া' কবিতার এক টুকরো—'তুমি এসো পিতামহ, প্রপিতামহের / অন্তর্জলিযাত্রাদিনে দেখেছিলেন দিকচক্রবালে / সায়াহ্নে ধূলির ঝড়ে বিহগ তৃণের দল, নৈদাঘ ঝঞ্ঝায় / রজনীর কলরব; মুণ্ডিত প্রভাতে একবার / সপিণ্ডীকরণহেতু এই ঘাটে এসেছিলে তুমি / আজও সেই অপব্যয়ে তুমিও এসেছ পিতামহ / প্রপিতামহের সঙ্গে

সমাপক্তোদকে।' লক্ষ্য করতে হবে কবির দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলা বিশাল পটভূমি। হয়তো একারণে তাঁর তৎসম আগ্রহ প্রয়োজন ছিল।

কবিতার শুরু থেকে শেষ অবধি বিবৃতি গল্প ও প্রত্যক্ষতা ছিল। যা কাব্য অভিধানে অচ্ছুত। অসংস্কার চিন্তায় সীমাবদ্ধ। কবিতায় সেই আকাশের কথা ভাবব, যার কোথাও কখনও বজ্র বিদ্যুৎ থাকবে না। আগুনের সংকেত কিংবা অতিবৃষ্টির ঝাঁপান থাকবে না। জীবনের শব্দরূপ রচনার প্রয়োজনে সব শুদ্ধচারিতা উপেক্ষা করেছেন মণিভূষণ। সম্ভবত পাবলো নেরুদার মতো বলতে চেয়েছিলেন, 'চাই অশুদ্ধ কবিতা'। এক অকপট জবানবন্দিতে বলেছিলেন, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বড় অংশ, পুঁজিপতি শ্রেণির চাপে পড়ে, ধীরে ধীরে সর্বহারা হয়ে যায়। ...একটা ভয় আতঙ্ক তাঁদের মধ্যে কাজ করে। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা ছোট অংশ উপরের দিকে উঠে গিয়ে দালাল এবং মুৎসুদ্দিতে পরিণত হয়।' কবিতায় বলেন, 'যার জমি আছে সেই কৃষক / যে চাষ করে, সে নয় / যে বানায়, গড়ে, নির্মাণ করে, বা উৎপাদন করে, সে শ্রমিক/ কিন্তু যার টাকায় হয়, সে-ই উৎপাদক।'

তাঁর অন্তর্জগৎটি তখন আরও দৃঢ়ভাবে তৈরি হচ্ছে, ধরা যাক, 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' থেকে দীর্ঘসময় পরে প্রকাশিত 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'-র মাঝখানের সময় অর্থাৎ বহু আলোড়িত ষাটের দশক। প্রথম কাব্যগ্রন্থের দু-তিন বছর আগে ঘটে গেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবাদ আন্দোলনের সবচেয়ে বীভৎস কালো দিন। আন্দোলনকারী অহিংস ও নিরস্ত্র অন্তত আশিজন গ্রাম্যমানুষকে পুলিশ স্রেফ পিটিয়ে হত্যা করেছিল। সংঘটিত হল ভারত-চিন যুদ্ধ, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ভিয়েতনাম-আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তোলপাড়-করা আন্দোলন। সারা ভারত জুড়ে খাদ্য আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক আন্দোলন, বন্দিমুক্তি আন্দোলন, ছাত্র রাজনীতির অস্থিরতা। ভারতের পার্লামেন্ট তখন প্রকৃত অর্থে শুয়োরের খোঁয়াড়। যা আজও অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। দশকের শেষ দিকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নির্ঘোষ। এই পর্বে তিনি মোটেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। অনেক আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল। শিক্ষক আন্দোলনে কারারুদ্ধ হয়েছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তিনি প্রতিবাদের অগ্নিবাসনায় স্পষ্ট আক্ষরিক। তীক্ষ্ণ খাগের কলম আঁকড়ে নিশ্ছিদ্র তমসায় ডুবে যাওয়া গান্ধিনগরের ঠিক মধ্যিখানে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ালেন। বুঝে নিয়েছিলেন সংঘাত ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মুখ ও মুখোশ। না-হলে আজ এমন রক্তিম কলেবরে বাংলা কবিতা নিয়ে মোটেই গর্বিত হওয়া যেত না।

এই সময়ের মধ্যেই মণিভূষণের শ্বেতশুভ্র দীর্ঘ গ্রীবার 'রাজহাঁস' বিস্তীর্ণ সরোবরে সাঁতার কাটল। 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'-তে এল একুশটি রাজহাঁস। যারা তাঁর জীবনের চলচ্ছবিকে প্রকাশিত করে। চেতনার কমল স্রোতকে ব্যঞ্জনা দেয়। তাঁর স্বপ্নের অপরিশোধিত মস্তাজ। যে রাজহাঁসকে বুকের গভীরে, ফুলের ভেতরে রেখে অন্য এক উন্মাদনার প্রকাশ। ঝড় ও ঘূর্ণি আসে, রক্তপাত আসে। হঠাৎ দীর্ঘ গ্রীবা মুচড়ে দেন, ঠোঁটে রক্ত দেখা দিলে করতালি মুখর—তারপর পালক ছাড়িয়ে, পাঁজর ভেঙে তাকে আসঙ্গে জড়িয়ে ধরতে চান। এই ভিন্ন আচরণ কবির একান্ত নিজস্ব। বাংলা কবিতায় যার দ্বিতীয় নেই। রাজহাঁসেরা আবার ফিরেছিল দুহাজার আট সালে পঞ্চান্নটি কবিতার পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থে। কবির ব্যক্তিগত লাবণ্য ও 'ফিরেছে

দক্ষিণ হাওয়া সন্ধ্যাতারা পশ্চিম কপালে'র মতো নির্জন উপাদানে এক প্রত্নসাম্প্রতিক আড়ালে তারা আজও সন্তরণে।

'উৎকণ্ঠ শর্বরী'র পঙ্‌ক্তিতে এসে যাচ্ছে ঘৃণা রাগ আপাত-অশ্লীল শব্দ এবং তির্যক শ্লেষের গাঢ় লবণ। এসে গেছে গল্পময়তা ও বিবৃতির স্পর্শ। প্রতিটি শব্দে গেঁথে দিয়েছেন প্রতিবাদ, যে প্রতিবাদ ব্যক্তিগত নয়, উত্তাল গণভিত্তি নিয়ে সারা দেশের মর্মে। স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন, 'এক পাটি পায়ে রাখো, অন্য পাটি ছুঁড়ে দাও। 'নিরপেক্ষ' কবিদের মুখে'। 'দিনলিপি' কবিতায় সমকালীন ঘটনা, 'পিছুমোড়া হাত-পা-বাঁধা আটটি যুবকের দেহ পড়েছিল ঠান্ডা বারাসতে।' উনিশশো সত্তর একাত্তরের বীভৎসতা দেখেছেন এমন কিশোর কিংবা নবীন আজও বেঁচে আছেন, যারা রাতের দুঃস্বপ্ন থেকে প্রতিদিন দেখেছেন গুলিবিদ্ধ যুবকের লাশ। এই কবিতায় আরও অনেক দেশাংশের নাম, যশোর রাজশাহি ঢাকা চট্টগ্রাম এসেছে। ইন্দোচিনের নামও কবিতার পঙ্‌ক্তিতে এসেছে অনিবার্যভাবে। খোলাখুলি বর্ণিত বলেই সর্বজনীনতা ও গণভিত্তি পেয়ে গেছে। টপিক্যালিটি ছিলই। এমন বিবৃতি ছাড়া এ কবিতা সম্ভব হত না। আরও কয়েকটি 'শ্রেণী সচেতনতা', 'সমাবর্তন', 'নিরাপত্তা পরিষদ', 'সাহিত্য একাদেমিকে খোলা চিঠি' কবিতাগুলি শুধু এ দেশ নয়, সারা বিশ্বের পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলেছে।

সে এক মুহুর্মুহু বজ্রঘোষিত সময়। এপার বাংলায় নকশাবাড়ি আন্দোলন, ওপার বাংলায় অনেক রক্ত ঝরিয়ে কামানের গোলায় পুড়ে পুড়ে একটি নতুন দেশের জন্ম হচ্ছে। প্রকৃতির খামখেয়ালে আকাশবন্যায় থইথই। দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, এপার বাংলায় কলোনিয়াল সিনড্রোমে ব্যাধিগ্রস্ত অভিজাত কবিরা দেশ, বিক্ষুব্ধ সময় ও সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে নীরক্ত কবিতায় শিশুর মতো দেয়ালা করছেন। গান্ধিনগরের রাত্রি যত গভীর হয়েছে মণিভূষণ আরও বেশি কালপর্বের আগুনে প্রবেশ করেছেন।

কবিতার প্রচলিত সংজ্ঞা অস্বীকার ও রাজনৈতিক ভাষণের চরিত্র আত্মসাৎ করে উনিশশো চুয়াত্তরে প্রকাশিত হয় 'গান্ধীনগরে রাত্রি'। মণিভূষণ ভট্টাচার্যের সবচেয়ে বেশি পাঠকপ্রিয় ও প্রতিবাদী কবিতার অন্য দিগদর্শন ও তূণীর থেকে এক একটি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ হয়েছে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণির দিকে। স্পষ্ট বক্তব্যে সোজা তর্জনী তুলেছেন ক্ষমতাবান প্রকৃত বর্বরদের প্রতি, যার জাবাব দেওয়ার কোনও ভাষা রাষ্ট্রের ছিল না। না-হলে তাঁকে নির্ঘাত জেলের ঘানি টানতে হত। সে সময়ে বাংলা কবিতা অসাড়ত্ব ছেড়ে এমন বোমা ফাটানো ধামসা -মাদল চাইছিল। সাবঅল্‌টার্নদের গল্প বলতে বলতে নির্মম বাস্তবতার গনগনে উনুনে কর্কশ ও প্রতিঘাতের ভাষায় ঠিক সেই কাজটাই করে দিলেন। যার দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল আগে প্রকাশিত হওয়া দুটি কাব্যগ্রন্থের জ্বলন্ত খান্ডবের জমিতে। কমিটমেন্টে স্থির বিশ্বাস না-থাকলে—সে সময় সে আঙ্গিকচর্চায় বাংলা কবিতার তরঙ্গ ছিল—'কয়েকটি কণ্ঠস্বর'-এর পরে অন্য পরিসরে কিংবা কলোনিয়াল সিনড্রোমে আক্রান্ত হতে পারতেন। তা হন নি বলেই 'বিগ হাউস' বশ্যতাকে ছুঁড়ে ফেলতে পারলেন। আর সারা বিশ্বে গণগর্জনের কাব্যদলিল পেশ করতে পেরে বাংলা ভাষার গর্ব স্থায়ীভাবে সাত আসমানের সিংহাসনে পৌঁছে গেল। শোনা গেল আত্মপ্রত্যয়ে নিবিষ্ট রাজনৈতিক চেতনার জ্যা-বদ্ধ টানের গভীর টংকার। প্রধানত টংকারটি এইরকম :

'গোকুলকে সবাই জানে, চিনে রাখলো ডি. আই. বি'র লোক
স্টেটস্‌ম্যান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে, গোকুলের মা
অন্ধকার ঘন হলে বলেছিলো, 'আর নয়, এবার ফিরে যা'—
ফেরার আগেই খাকি রক্তের বিদ্যুৎ দরজায়
রভলভার গর্জে ওঠে গর্জায় গোকুল
রাষ্ট্রীয় ডালকুত্তা ঝুঁকে ছিঁড়ে নিলের এক খাবলা চুল
রাতকানা মায়ের চোখে কুরুক্ষেত্রে বেল্টর পিতল, বুট,
জলস্রোতে নামে অন্ধকার
শবচক্র মহাবেলা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
পাথরে পাথরে গর্জে কলোনির সুভদ্রার শোক।

অধ্যাপক বলেছিলো, 'দ্যাট্‌স্ র-ঙ, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'
মাস্টারের কাশি ওঠে, 'কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!'
উকিল সতর্ক হয়, 'বিস্কুট নিইনি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে।'
চটকলের ছকুমিঞা 'এবার প্যাঁদাবো শালা হারামি ও. সি-কে।'

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজী রক্তধারা,
'গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিলো তারা।'

শেষ পঙ্‌ক্তিটি ধার করে লিখতে হয়েছে একরকমের প্রয়োজনে। একটি রবীন্দ্রগানের প্রথম লাইন ও একটি আধুনিক কবিতার শেষ লাইন হিসেবে চার চাঁদের সুগ্রহণ। যেন অজান্তে কোথাও লকলক করে উঠল গোকুলের পরিণতি। এমন অদ্বিতীয় প্রয়োগ বাংলা কবিতায় এক নম্বরে।

এক কে করে এসে গেছে, 'ক্ষমা প্রার্থনা', 'ডানকানের মৃত্যু', 'মন্টুর জীবন', 'একটি শ্লোগানের জন্ম', 'শহিদ দিবসের গল্প', 'কোনো কবিসম্মেলনে' এবং প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন নিজস্ব 'ব্ল্যাক হিউমার', যা এই নদীমাতৃক ভাষায় খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল। 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর'-এ কবির দৃশ্য ও দ্রষ্টার হাইফেনে যে তেতো হাসির ব্যঞ্জনা শুরু হয়েছিল তা পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছি—

'কারণ পোশাক নেই সেহেতু আমার মৃতদেহ
ফুটপাতে পড়ে আছে। পৌরসভা বড়োই দয়ালু,
চুক্তিবদ্ধ শকুনেরা বুকে নিয়ে অনবদ্য স্নেহ
গোল হয়ে বসে আছে। নাগরিক শিরঃপীড়া মুগ্ধ করে তালু।

আমার শীতল রক্তে শহরের ঘোলা নোংরা নর্দমার জল,

মগজে সাজানো আছে সবজান্তা শয়তানের বাসা,
স্বর্গে না নরকে যাব স্থির করতে পারি না কেবল
মরবার পরও দেখি বেঁচে আছি খাসা।' (পোশাক)

এবং এই কবিতাটির সঙ্গে পড়ে ফেলা দরকার 'সেলুন'-কে। আর খুব প্রয়োজন 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'র 'ঘর-সংসার'-কেও।

'আমার সবই পড়ে রইল, দরজাটি আধখোলা,
পাশের ঘরে কুসুম নেই, নিঝুম, শিকল তোলা—
পেছন থেকে জ্যোৎস্না এসে বাগানে পুবদিকে
মুখে রুমাল গুঁজে দিল কুসুমকুমারীকে,
তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।'

যে কুসুমকুমারীকে পাড়ার তিনটি যুবক দিঘির পাড়ে অন্ধকারে নষ্ট করেছিল, তাকে আবার সসম্মানে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলছেন। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করি কবির ভাষা পালটে যাওয়া। তৎসম আসছে না। গম্ভীরতা কোথাও নেই। তুমুলভাবে আসছে সাধারণ ভাষা। এখন যা ঘটছে, কখনও ঘটবে কিংবা যা যা কবিকে আঘাত করছে ঠিক তারই সিনেম্যাটোগ্রাফি তাঁর, বোধে, গভীর অন্তর্দেশে। কঠোরভাবে বর্জন করলেন অনিরপেক্ষতা, ধোঁয়াশা ও নির্বেদ। আপসহীন কবিতা লিখলেন সারা বিশ্বের পুঁজিবাদী শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে। আজ টের পাওয়া যাচ্ছে তাঁর কবিতার দ্রোহ। চিরাচরিত পাঠক, যারা ভেতরে ভেতরে দেঁড়েল—এই রাজনৈতিক ভাষণের প্রতি তর্ক আনতে পারেন। সে জন্যে পোলারিস স্থান বদল করে না। তেমনই অমোঘ সত্যটি হল মণিভূষণের জাত-ই এমন, যাঁর কবিতা রাজনৈতিক ভাষণের প্রতিলিপি হলেও শীর্ষ আরোহন করে। পশ্চিমি ধ্যান বাদ দিয়ে দেশীয়, একান্ত দেশীয় উপাচারে, লোকায়ত গঠনে মণিভূষণ পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে কবির মানসলোকের পশ্চাদভূমি।

গান্ধীনগরের এই ভয়ংকর রাত্রি একদিনে আসেনি। যা আজও নিকষ কালো আর প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে ঘুরপাক খচ্ছে। পটভূমি তৈরি হয়েছিল অনেক আগে থেকে। সে আলোচনা ইতিহাসের। কারণগুলি স্মরণে রেখে প্রস্তুত হতে হবে 'গান্ধীনগরে রাত্রি' পাঠের জন্য। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'একটি শ্লোগানের জন্ম', যার উল্লেখ না-করলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ ও অর্ধমতিতে সমাপ্ত হবে। সাধারণ মানুষ ও অপরিসীম দায়বদ্ধতা না থাকলে এ কবিতার জন্ম হত না। আংশিক উল্লেখ—

'আমি তো রাইফেলের গুলি নই যে সটান ছুটে যাবো—
ঢোঁড়া সাপ, আমাকে এঁকে বেঁকে চলতে হয়।
যতই এ-গলি ও-গলি করি না কেন
আমার লক্ষ্য কিন্তু বাদশাহী সড়ক,

অবশ্য আমরা পৌঁছব তখন সেটা আর বাদশাহী থাকবে না,...

যখন দেখি, 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' তখন বুঝতে পারি
বিষয়টা সহজে হবার নয়।...
অথবা যখন অধ্যয়ন করি—
'এশিয়ার মুক্তিসূর্য জিন্দাবাদ', তখন রাস্তার মোড়ে একটা ভিখিরির
বাড়ানো হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি এই দু'নম্বর মুক্তিসূর্যের দিকে
ভুরু কুঁচকে তাকাই—ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে চোখ পুড়ে যায়, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়,
কিন্তু ঝলসানো তামার থালার মতো আকাশ আমাকে
মুক্তির কথা কিছুই বলে না।

যখন পড়ি, 'কমরেড কানু সান্যালকে জেল ভেঙে ছিনিয়ে আনুন'—
তখন ভাবি, এঁরা অন্যের উপর দায়িত্ব দিয়ে
চলে গেলেন কেন? কিংবা আলকাতরা এবং ব্রাশের নৈশসংঘর্ষে
যখন দেওয়ালে ফুটে ওঠে, 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' তখন
ক্ষমতার আগে 'রাজনৈতিক' শব্দটা নেই বলে আমি আঁতকে উঠি...

.....একটা আট-দশ বছরের
উলঙ্গ ছেলে
গুলমার্গ থেকে বিবেকানন্দশিলা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপিয়ে দিয়ে
ভারতবর্ষের সমস্ত দক্ষিণবাহিনী নদীকে
বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে
সমস্ত অস্ত্রকারখানা, বিমানবন্দর, সমস্ত বেনামি জমির দলিল
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া, যৌনসাহিত্যে আগুন লাগিয়ে দিয়ে
বিশাল পর্বতমালা জলস্রোত মাঠ-ময়দানের সমস্ত
খরশান জমায়েতকে তিনটে শব্দেরমধ্যে স্তব্ধ ভয়ঙ্কর তোলপাড় ক'রে
খাটিয়ার উপর লাথি মারতে মারতে তার
সুকেশিনী ধূর্ত সৎমাকে চিৎকার করে বললো—
'ভাত দে হারামজাদী'।

এই প্রসঙ্গে নিজস্ব ধারণা রাখি। মণিভূষণের কবিতায় সরাসরি চরিত্র এসেছে। কাহিনীধর্মিতা টেনে নিয়ে গেছে শেষ পঙ্‌ক্তি অবধি। অনেকেই এমন ধরণকে মাসন্য করেন না। কবিতার দুর্বলতা ব্যখ্যা দেন। মহাকাব্যগুলির দিকে তাকালে দেখি সেখানে কাহিনি, চরিত্র, যুদ্ধ হাত ধরাধরি করে অসাধারণ পরিণতির দিকে চলে গেছে। মনে করতে পারি, গত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে শেলি-কিট্‌স-এলিয়ট পরে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরে বোদলেয়ার-গিনস্‌বার্গ বাংলা কবিতায় দেশীয় চরিত্র বেশ খানিকটা ঘুলিয়ে দিয়েছেন। যার

আফটার-শক এখনও চলছে। দেশীয় ঐতিহ্য বহুদূরে ধুলো মাখামাখি এবং তাচ্ছিল্যে নীরব। সত্তর দশকের প্রভাতকালে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাঙচুর চলছিল সেখানে নিজেকে কুয়াশার ভেতর কিংবা অবচেতনে রাখতে পারেন নি মণিভূষণ। প্রমাণ করেছেন, শেষমেশ তিনি একজন সামাজিক ও রাজনৈতিক মানুষ।

ছবির মতো ভেসে আসছে 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান'-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাখানি। সটান রবীন্দ্রকবিতার নাম। এবং এসেছে তার ছেলেবেলায় দেখা আসানসোলের রেলকলোনি। রেলশ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও সংগ্রাম। পড়তে পড়তে সহমর্মী পাঠক চেতনায় যে দংশন অনুভব করেন তাতে শাসকের প্রতি চরম ঘৃণা জেগে ওঠে। এত স্পষ্টভাবে লিখেছেন—সন্দেহ হয়, এত বড়ো কবি, কেন শিল্পগুণ নষ্ট করে এমন লিখনভঙ্গিমা নিলেন! কবিতাটি লেখা হয়েছিল 'গান্ধীনগরে রাত্রি'র অনেক পরে। তাহলে কি কবিতাকে আরও বেশি সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এই প্রয়াস? মণিভূষণের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'র কাছে এ প্রশ্ন নিতান্ত খেলো ও শ্রেণিচেতনার দিক থেকে অসহায়। কেননা মধ্যবিত্তরা কেউ 'মন্টুর জীবন' যাপন করেনি। নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে বেরনো অনেক কষ্ট।

> 'কিন্তু পাউরুটি কেটে দু'টুকরো করে দুজনকে দিয়ে দিলেও তার হাতে আর একটা জিনিস
> থাকে—ভারতবর্ষের অন্ধকার আকাশে হঠাৎ লাফিয়ে-ওঠা বিদ্যুতের মতো আট ইঞ্চি লম্বা ঝকঝকে একখানা ছুরি।'

মণিভূষণের মতো পরিপূর্ণ বিবেকবান কবি লেখনীর স্রোতে—যখন অন্ধকার গান্ধীনগরে শেফালি ফুটেছিল—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'র দিকে যাবেনই।

শোষিত শ্রেণির দিকে কমিটমেন্টে বিশ্বাসী কবির একটি সাক্ষাৎকারে পাই—'আমি তো সমসাময়িক সমাজ এবং এই সাধারণ মানুষের বেদনার কাহিনী নিয়েই কবিতা লিখি। কজেই আমার কবিতার মধ্যে কিছু প্রকৃতি-চিত্র ছাড়া অধিকাংশই মানুষের দিনযাপনের গ্লানি, তাঁদের সংগ্রাম। বিশেষ করে সত্তরের দশক থেকে আমি এ ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন হয়ে পড়েছি। (মণিভূষরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রৈবতক, জুন ১৯৮৮)। যে কবি ঘোষণা রাখেন, 'কবিতা হচ্ছে মুক্তির গান।' (ভাষা, বিশেষ সংখ্যা ১৯৯২)। এমন স্থির চিত্তে কবিতা সম্পর্কে তাঁর দর্শন ব্যক্ত করেছেন যা এই বিশ্বায়নের সময়ে যখন শ্রমজীবি মানুষের বুকে লাথি মারছে তখনও কেউ বলতে সাহস করেন না। ভিনগ্রহের বাসিন্দাদের মতো কাব্যসৌন্দর্যে মশগুল ও ধোঁয়াশার দোলায় দুলতে থাকেন।

এমন নয় যে মণিভূষণ প্রথম আত্মপ্রকাশের দিনগুলিতে প্রেমের কবিতা লিখতেন। 'তুমি' শব্দের ব্যবহারে কোনও ইন্দ্রজাল কিংবা খোয়ারি নেই। তাঁর কবিতার খুব একটা অন্তর্মোচনের দরকার হয় না। যে পদ্ধতি এখন বেশ একটা মান্য রীতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম থেকেই প্রতিবাদী সুরের সারেগামা এবং সামাজিক দ্রোহের আদর্শলিপি। যার অনমিত স্বাক্ষর শুরু হয়েছিল 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর'-এর 'বড়োদিনের ছুটিতে' কবিতার লক্ষণে—'শহরে

ফরলো তারা, রক্তস্রোতে ফসিলের মতো পূর্বসূরী / সামাজিক সততায় অর্ধমৃত পঞ্চম ঋতুতে; / ঘাতক স্মৃতির হাতে নিরুত্তর রক্তমাখা ছুরি / সশরীরে পাঁচজন পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূতে।'

অন্ধকার গান্ধীনগরে পর পর প্রকাশিত হয়ে চলেছে 'মানুষের অধিকার', 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান', 'প্রাচ্যের সন্ন্যাসী', 'ঐতিহাসিক পদযাত্রা'। একই বাচনে দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বিষয়বস্তুতে অবিচল। কিন্তু অভ্রান্ত। কোনওদিন বলেন নি, পাবলো নেরুদার বলতে পারতেন, চাই অশুদ্ধ কবিতা। মুক্তির গানে কোনও শিল্পের মাপজোক দরকার নেই। কমিটমেন্টে বিশ্বাসী কবিদের মুশকিল হল, শোষিত নিপীড়িতদের কথা বারবার লিখতে হয়। এই কাব্যগুলির মূল সুরও তাই। তবু বিস্ময়ের সঙ্গে পাঠ করতে হয় 'সুকান্ত ভট্টাচার্যকে খোলা চিঠি'—'তুমি যে ভরপুর প্রাণের আবেগে লেনিন হতে চেয়েছিলে— / সেই তাঁকে নিয়েও এখন ভাগ বাঁটোয়ারা চলে : ফলে— / ভাগের মা গঙ্গা পায় না, / একথা তো তুমি পরিষ্কার জানতে / এই কোটি কোটি পিছুমোড়া হাত-পা-বাঁধা ক্রীতদাসের বাজারে / সব কিছুই পণ্য— / এই মৌসুমী অঞ্চলে ফুল ও ফল / ঐ বাতাসা হাতে ছুটন্ত ছুটন্ত শিশুটির চিবুকের তিল, / এই জরবদস্তি জীবনের সমস্ত লবঙ্গ ও এলাচ / ঐ রোদে পোড়া ফুটপাতে ডান হাতের আঙুলকাটা আসন্নপ্রসবা / ভিখিরি মেয়েটির চিত্রকল্প, / নিঃস্বের ন্যাকড়া কিংবা পণ্ডিতের মগজ, / এমনকী তোমার জন্মদিনও / পণ্য।'

শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব, অতিবাস্তব, স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের শিকড়ে কিভাবে ভন্ডামি তারাবাজি অলো ছেটায়, সব্যসাচী দেব-এর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সত্তরের দশক মুক্তির দশকের বদলে ছিন্নমস্তার রক্তের দশকে পরিণত হয়েছিলো।' আরও বলেছিলেন, 'কবিতাকে আমি নিছক রোমান্টিকতা বা বিশুদ্ধ শিল্প বলে ভাবি না।' 'জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে আমি কবিতা লিখি না। লিখি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য, বিবেকের নির্দেশে।' দীর্ঘ কবিতা 'দক্ষিণ সমুদ্রের গান'-এ পাই—'এই শহরের সমস্ত বিষধর সাপের পিছল পরামর্শ ভেদ ক'রে / আড়াল থেকে চেম্বর অব কমার্সের সুতোটানা বিপ্লববৈরাগী / নেতাদের সমদূরত্বসূচক পুতুলনাচের জমাট আসর তছনছ ক'রে দিয়ে / যাবতীয় মগজ পচানো শিল্পকর্ম / আর লোক-হাসানো উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ধ্বংস ক'রে / একদিন মধ্যরাত্রে জেগে উঠবে এই শহরের লোমহর্ষক অভ্যুত্থান।' এবং পড়ি 'ফেরা', 'দধীচি', 'বেকারের চিঠি', 'পদ্ধতি'র মতো কবিতাগুলি। হাজার বছর আগে থেকে নিরন্তর বাংলা কবিতায় চিরকালীন ভাষারূপ ছিল। যার শেষতম প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ। সেই উপাসনার শব্দ-দেউল ভাঙতে শুরু করে গত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে। নানা রূপে-রসে-বর্ণে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ আছড়ে পড়ে। ক্রমে বাংলা কাব্যজগৎ বিশেষ ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অন্য ধারার কবিতা ছাড়া চল্লিশে পঞ্চাশে ষাটে শ্রমজীবী মানুষের কবিতা এসেছে সন্তর্পণে। বিশেষ নিয়ন্ত্রণের গণ্ডিরেখায়। মণিভূষণ এসেছেন বাস্তবের পরে অধিকতর বাস্তবে। এমন সড়কি চালানো হৃদয় নিংড়ানো উচ্চারণ বাংলা কবিতা আগে কখনও দ্যাখেনি। এবং তার চরিত্রে এসে গেল আদিগন্ত পটভূমি, বৈপরীত্যের বিপুল জমায়েত।

'ঐতিহাসিক পদযাত্রা'য় এল বেশ কিছু দ্বিপদী চৌপদী। ছোটো ছোটো বক্তব্যের পূর্ণ কবিতা। এসেছে প্রেম প্রকৃতি দেশ ও সমাজের স্মরণ। যেখানে কবিতা যেন যে কোনও

সীমানা ছিঁড়ে চলে গেছে ব্যাপ্তিতে। তার একটি—'কাঠের পাশেই আগুন রয়েছে / আগুনের পাশে লোক, / না ধরিয়ে দিলে আগুন জ্বলে না / দল মত বড় হোক।' আর একটি—'যখন বলি, 'ভালোবাসি', / ভাবি কাকে? তোমাকে? না নিজেকে? / যখন দুজনেই চুপ ক'রে থাকি / তখনই আকাশ এবং সমুদ্র / আলোয় ভ'রে ওঠে।'

নকশাল আন্দোলনের বজ্রনির্ঘোষ নিয়ে মণিভূষণের শিল্পচৈতন্য অবিচল ছিল গত শতাব্দীর শেষ প্রহরেও। যেটা ছিল তাঁর কবিতাবিশ্বাসের মূল ধর্ম, সোচ্চার মন্ত্র ও গূঢ়তম বিহরণ। যে একাগ্রতায় তাঁর বিশাল আগ্নেয় জলযানের কোর্স কখনও ডিগ্রি বদল করেনি। অভিযাত্রার দিকে এমন স্থির কলম বাংলা কবিতায় জুড়ি পাওয়া যাবে না।

'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' যখন প্রকাশিত হয়েছিল আমি ইজের পরে খালি পায়ে গ্রামের ভাঙা ইশ্‌কুলে যাওয়া বালক। দশ বছর পরে 'উৎকণ্ঠ শর্বরী' প্রকাশের সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় ছুটে বেড়াচ্ছি জমিন আসমান। তারপরেই সমুদ্র ডেকে নিয়ে গেল আদিগন্ত নিরক্ষর জলে। চুয়াত্তরে সারা ভারত রেল ধর্মঘটের মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিলাম। ততদিনে কবিতা পড়তে শিখে গেছি। পৃথিবীর অন্য ভাষার কবিতাও পড়ি বিভুঁইয়ে বসে। পেয়ে গেলাম নিউজপ্রিন্টে ছাপা ও সস্তা বাঁধাইয়ে 'গান্ধীনগরে রাত্রি'। যাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম তিনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেই আমার প্রথম মণিভূষণ পাঠ ও শুরু। সংক্ষোভে জর্জরিত হতে হতে এবং অন্য ভাষার ভারতীয় ও অভারতীয় বন্ধুদের কাছে গর্ব রাখতাম সত্তরের বজ্রনির্ঘোষের বসন্তকে বাংলা ভাষার একজন কবি প্রত্যক্ষ শব্দে লিখেছেন। একদিন যার নিষাদরক্তের একটি অক্ষরও বিস্মৃত হবে না। পৃথিবী জুড়ে শোষিত ও শ্রমজীবী মানুষের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে নানা সময়ে। কিন্তু সে যুদ্ধের এমন কোনও কাব্যরূপ কোনও ভাষায় কেউ লেখেন নি। একের পর এক আসছে 'বৈশাখের ফেরিওয়ালা' (১৯৮৯) 'অবিচ্ছিন্ন অন্তঃপুর' (১৯৯৩) 'পরিব্রাজকের জললিপি' (১৯৯৫) 'নৈশভোজ' (১৯৯৭) 'প্রচ্ছন্ন পরাগে' (২০০০) 'পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা' (২০০১) 'রাত তিনটের কবিতা' (২০০৪)। যেন 'বেকারের চিঠি'র কৃষ্ণধ্বনি শব্দে প্রতিশব্দে যার শেষ নেই—

'আমি যখন বস্তির
গণতান্ত্রিক খাটা পায়খানায় লাইন দিতাম,
মা নিজের-হাতে-দেওয়া ঘুঁটে জ্বালিয়ে চা ক'রে দিতেন।
সেই স্যাঁতসেতে অন্ধকারে ধোঁয়াটে আগুনের সামনে
বসে-থাকা মাকে আমার ভারতবর্ষ বলে মনে হোতো।'

এবং পড়ে ফেলেছি মরচে-ধরা বিপ্লবের সম্পূর্ণ অবক্ষয়—দেখতে পেয়েছি জনশোষণের নেতাকে—

হঠাৎ হুঙ্কার দিলেন—'মায়াকোভস্কির মত লিখুন।
কবিতায় জানগণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে দিন।'...

আমি জানি আমার অক্ষম কবিতাগুলিই
আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

'কিন্তু কী করবো বলুন'—আমি
পরীক্ষায়-ফেল-করা ছাত্রের মত হতাশ হয়ে
তাঁকে জানালাম—'মায়াকোভস্কির নেতা
ছিলেন স্বয়ং,
লেনিন। আর আমার নেতা হলেন
আপনি।।' (কপাল)

জরুরি অবস্থার সময়ে নিষিদ্ধ-করা বইয়ের তালিকায় ছিল 'বাতিল কবিতা' নামে একটি সংকলন। সেই সব আগুনের কবিতার মধ্যে মণিভূষণও ছিলেন। সে আগুন কখনও নেভেনি। বুক সেঁকে নিয়ে অনেক অনেক শীতের রাত পার হয়ে গেছে। এভাবেই তাঁর সামাজিক ভূমিকা পালনের দায় প্রকাশ করেছেন। কখনও ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক আখড়ায় নাম লেখান নি। কিন্তু তীব্রভাবে রাজনৈতিক। যার পার্টিকলস্ তেজস্ক্রিয়ের মতো ছড়িয়ে গেছে কবিতার লাইনে লাইনে। যে তেজস্ক্রিয়তা মানবজাতিকে বিকলাঙ্গ করে না। বরং সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার মন্ত্র শেখায়। পঁচানব্বইয়ের পরে কবিতার বিষয় ও বলার ধররণ পালটেছেন। সরাসরি রাজনৈতিক বদমায়েশি ও ক্ষমতালোভী নেতা-হাতা-চামচাদের দিকে আঙুল তুলেছেন। সে কারণে তাঁকে সরে থাকতে হয়েছে যে কোনও সাংস্কৃতিক মোচ্ছব থেকে। বিদ্বজনের সভাসমিতিতে, সম্মানীয় কোনও কমিটিতে, পুস্কার প্রদানের কোনও পদে, পত্রিকা পরিচালনেও ছিলেন না বা রাখা হয়নি। বার্লিন প্রাচীর ভেঙে গেছে অনেক আগে। সোভিয়েত রাশিয়ায় উৎখাত হচ্ছে পাথরের বিশাল লেনিন। টিভিতে সেই দৃশ্য সম্প্রচারের ভাবখানা এমন যেন শ্রমজীবী মানুষের লড়াই শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীর শোষিত মানুষ হতভম্ব। কিছু বুঝতে পারছে না। নানা রকম বিভ্রমে ভীত ও স্থবির। অন্য প্রকল্পনায় আস্তে আস্তে জেগে উঠছে লাতিন আমেরিকা। নিঃসীম অন্ধকারে ভেজা দেশলাই ঠোকা আলো। তখন কবিতাবিশ্বের বাংলায় পর পর একশো কবির কবিতা পড়ে মালুম হচ্ছে একজনের। উনিশশো সাতানব্বইতে প্রকাশিত হল 'নৈশভোজ'। যার কয়েক কছর পর ক্ষমতার পেশি ফুলিয়ে জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে বলা হবে টিনা টিনা টিনা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একমাত্র গতি। এখানে মেকি বামনেতাদের পাল্লায় লড়ঝড় করবে বামপন্থা। শাইনিং ইন্ডিয়ার ঘোষণায় ভারতবর্ষ আরও নিশ্ছিদ্র কালো। তার আগে চেতনা উস্কে দেওয়া 'নৈশভোজ' ঝিলিক দেওয়া রোদে চমকে-ওঠা ক্ষুর। গান্ধীনগরের অন্ধকার—কবে ভোর হবে সকাল হবে—আদৌ কখনও সূর্যোদয় ঘটবে কিনা—যার উত্তরে স্বয়ং ঈশ্বরও নিরুত্তর—বহুজাতিক রাক্ষসের পেটে ঢুকে যাচ্ছে পাহাড় নদী অরণ্য—এল 'নৈশভোজ'। আরও একবার বৈদ্যুতিক ঝটকা দিলেন মণিভূষণ।

'নৈশভোজ'-এর ব্যাকগ্রাউন্ড লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার'। যেখানে শিষ্যদের নিয়ে যিশু গির্জার ভোগমণ্ডপে পবিত্র অন্তিম নৈশভোজ সারছেন এবং কম্যুনিয়ন প্রতিষ্ঠা

করছেন। পৃথিবী বিখ্যাত সেই ছবি এই 'নৈশভোজ' কবিতার মর্মে উবু হয়ে বসে আছে। একটি অসাধারণ পুনর্নির্মাণ। বর্তমান সময়টি যেন আপনি চাইলেই নৈশভোজের টেবিলে হুবহু ওই ছবির মতো সেজে উঠবে। রং ও রেখার টানে 'লাস্ট সাপার' যে কথা বলেছিল—বারোজন শিষ্যসহকারে যিশু রুটি ও মদ দিয়ে খেতে বসেছেন। শিষ্যদের জানালেন, তাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক হবে। আমাকে ধরিয়ে দেবে। ভিঞ্চির ভাষায়, সে এক নীরব কবিতা। মণিভূষণের 'নৈশভোজ'-এও তেরোজন। এবং দিনটি তেরোই শ্রাবণ, তেরো রকম রান্নার পদবিন্যাসে মাছে পৈশাচিক ইশারা। একটি বিসর্পিল বিনোদনের কেন্দ্রভূমি। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন মার্কিনি মুদ্রাদোষের খুঁটিনাটি। 'বিশ্বাসঘাতকতা' শব্দটির তীর্যক ও কুশলী ব্যবহার বয়ানের সঙ্গে সঙ্গে ওতপ্রোত। এ প্রক্রিয়াটিও যেন রান্নার সমার্থক। মানুষ হত্যার সুপরিকল্পিত কাহিনী, এবং দেশিয়করণ ঘটেছে ইস্টাররাত্রিকে বাদ দিয়ে, ক্রিসমাসের শীতকে বাদ দিয়ে। কবি লিখেছেন, 'এই মহাভারতের প্রতিষ্ঠার ভেতরে তাই মিশিয়ে দিয়েছি এক হন্তারক অমবস্যা রাত্রি।' তেরোজন আমন্ত্রিতের মধ্যে পাঁচজনের গাড়ি আছে। বাইরে সমাচ্ছন্ন বৃষ্টি। বাকি সাতজনের মধ্যে একজন সুদূর নাজারেথ থেকে আসা বালক।

আমাদের দৃষ্টি শুধু বালকটির দিকে। তিল তিল করে এই সৌম্য সন্তানের বিশ্বনির্মাণ স্বপ্নকে হত্যা করা হবে। কিন্তু কেউ জানত না, স্বপ্ন এবং স্বপ্নদর্শীকে এক সঙ্গে হত্যা করা যায় না। আর কবিতার প্রথমেই জেনে গেছি, 'আমাদের প্রতিটি শোণিতকণায় যে বিশ্বাসঘাতকতার বিষবীজ সংগুপ্ত আছে তাকে উৎপাটন করার পদ্ধতি এখনো আমাদের নির্ভুলভাবে জানা নেই। শুধু জানি, বহনের কোনো সীমা নেই, দহনের কোনো পরিসীমা নেই এবং এই বৃষ্টিরও কোনো সমাপন নেই'। মণিভূষণ জানিয়ে দেন, হিংসায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় সকলেই চূড়া আরোহণ করেছে। তেরো সংখ্যাটি আর অশুভ নেই। গোটা পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে সীমাহীন ধান্দাবাজিতে, চৈড়ালব্রতে আর দুর্বৃত্তায়নে।

এখন রবীন্দ্রনাথ বাজছে খুব। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে তিনি বেজে চলেছেন দিনরাত এবং অস্থানে কুস্থানেও। ভেতরে হতমান বিবর্ণতা কিছুতেই ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। 'আজকের রবীন্দ্রনাথ'-এ বলেছেন—'তোমার মল্লিকাবনে / যখন প্রথম ধরেছে কলি / ভোট হস্তগত ক'রে / জল্লাদ কেটে রসকলি।' মিলে যাচ্ছে মিশে যাচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক শরীর ও দেশের আনন্দশির। চারপাশে শুধুই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার ও বঞ্চনা। রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে নেতা-আমলা-পুলিশের গাঁটছড়া বাঁধা নির্যাতন ও সন্ত্রাস। কৃষক ও শ্রমিকের শোষণ। সমাজবিরোধীরা তোফা আরামে ও সসম্মানে ঢুকে পড়েছে রাজনৈতিক দলের শীর্ষে ও পার্লামেন্টে। আসমুদ্রহিমাচল এই পুণ্যভূমিকে বোকা বোকা মনে হয়। নিহত জ্যোৎস্নায় মহান গণতন্ত্র পাগলের মতো হাসতে থাকে। হাসতেই থাকে এবং পাঠ করি—'পৃথিবীকে এই শিশুর বাসযোগ্য করা যাচ্ছে না বলেই / রাজনৈতিক গাড়লরা শিশুটিকেই এই পৃথিবীর যোগ্য করে তুলেছে।' (শিশুটি বেড়ে উঠছে)। তবু সেই যে বিশ্বাসটি বেঁধে রেখেছিলেন প্রথম কবিতা-সংকলনে, তার ব্যত্যয় সারা জীবনে ঘটেনি। 'কারণ, মৃত্যু তো দাস আমাদের ঘরে, প্রতিষ্ঠানে, পুণ্য স্মৃতিচারণায়, পুষ্পগুচ্ছে, রৌদ্রদগ্ধ ঘামে। / পঁচিশে বৈশাখে কিংবা বর্ষনান্ত বাইশে শ্রাবণে / বরণীয় বীজমন্ত্রে বারংবার নবজন্ম আসে।'

(কয়েকটি কণ্ঠস্বর)।

মণিভূষণের আর একটি তীব্রতম বৈশিষ্ট্য—নাটকীয়তা। এই নাটকীয়তা তাঁর কবিতাকে আরও তেজিষ্ঠ করেছে। এই ধরণের প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ 'কোনো কবিসম্মেলনে'। পরতে পরতে ছড়িয়ে দিয়েছেন নাটক। দীর্ঘ কবিতাটির কোথাও এতটুকু বাহুল্য মনে হয়নি, টোল খায়নি। মাঝে মাএঝই এক একটা সচকিত বাঁক। যেখানে পৌঁছে পাঠক আরও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নাটকীয়তার আরও একটি স্মরণীয় কবিতা 'ডানকানের মৃত্যু'। আর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ধারালো ব্যঙ্গ ও কৌতুক। যা একান্তভাবে বাংলা কবিতায় মণিভূষণীয়। তার সঙ্গে মিশে আছে পবিত্র ক্রোধের গর্জন—

'কলম ছুঁড়ে দিয়ে ফরম্‌টা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সেক্রেটারির
মুখে উড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—
'স্কাউন্ড্রেলস্, আমাকে এভাবে ইন্‌সালট করার মানে কী?
আমি প্রাক্তন বিপ্লবী নই, এখনো বিপ্লবী।'

'আত্মভোজ'-এর (২০১১) ভূমিকাতে কাব্যপ্রত্যয় লিখলেন, 'এখন এই ঘোরলাগা সময়ের মধ্যেও যথাসম্ভব আত্মস্থ হয়ে লিখে চলেছি। আশা করছি আমার পাঠকরা কোনো না কোনো সময়ে আমার সামাজিক ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারবেন।' সমাজিক ভূমিকা পালনে কবির যে দায়বদ্ধতা এবং লিখতে থাকেন 'খরায় উজাড় গ্রাম... প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকে হাজারে হাজারে / না খেয়ে মানুষ মরে...' অপুষ্টিজনিত মৃত্যু লেখা হয় আনন্দবাজারে তাকে কবিতার কী হল? 'আত্মভোজ'-এর অনেকগুলি কবিতা তাই 'কবিতা' নিয়ে লেখা। সময় ও দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে ক্রমাগত আঘাত আসছিল। কবিতা কী অসার বস্তু হয়ে গেছে? 'পরিতাপ' কবিতায় পড়ি—'ক্ষুধার বেসাতি নিয়ে দিস্তা দিস্তা কবিতাও লেখা হয়ে গেছে, / লেখেনি কখনো কেউ রুদ্রচন্ডী রৌদ্র দিয়ে লেখা, / জাগেনি অত্যুগ্র কোনো সরস্বতী সরোদের চন্ড ঝনৎকারে, / কেবল পেটের গর্তে ছাই জমে বস্তুবিশ্ব ভারি হয়ে গেছে...'।

প্রকৃতিতে রৌদ্র ও রাত্রি সমান সমান। রাত্রি দিয়ে কবিতা লেখার প্রদোষে কখনও বিহরণ করেন নি। 'রজক' কবিতার এক টুকরো—'বাইরের কিছু কিছু তেতো বাসনপত্র আমার দিকে / ঝনঝন করে বেজে ওঠে / আমি সেই জমকালো চেঁচামেচি থেকে / একখানা কাঁসার থালা তুলে নিয়ে / পুবের আবছা অন্ধকারের দিকে ছুঁড়ে দেই /অমনি গাছপালা আগুন হয়ে ওঠে, / পাখিরা ডেকে নিয়ে আসে গাঙচিল, / স্রোত গুটিয়ে ছুটতে ছুটতে চম্পা নদী আসে / বন্ধুরা আসে, বন্ধরাই আসে।' তখনই কবিতার কাছে পাঠক জীবনের সাদা-কালো ছবিতে একাত্ম হন।

বাস্তবের প্রত্যক্ষ অনুবাদে জীবনের অভ্যাসগত রঙে শিল্প আসে না। মণিভূষণ জোরালোভাবে সেই প্রত্যক্ষ অনুবাদ করতে করতে কখন শিল্পে রূপ দিয়ে দেন, যেন পাঠক এটাই চেয়েছিলেন। একজন রসবোদ্ধা দেখতে পান শিল্পের নতুন কাঠামো চুল্লির প্রহরে দাউ দাউ। বাংলা কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ 'গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা'র মতো রবীন্দ্র পঙ্‌ক্তির অমোঘ ব্যবহার। রাশি রাশি কবিতালেখা বাঙালি কবিদের

অভ্যাসে এসেছে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ থেকে। এক একজন অভিজাত কবির কাব্যগ্রন্থ সংখ্যা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। মণিভূষণের সেই সংখ্যা মাত্র সতেরো। সতেরোর মধ্যে দুটি বই 'ঐতিহাসিক পদযাত্রা' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ও 'বৈশাখের ফেরিওয়ালা' অতীন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে মিলিতভাবে। একটি ছোটোদের জন্য অনবদ্য 'বাবুইয়ের বাসা'। ইংরেজি থেকে বাংলায় প্রশংসিত অনুবাদ 'গালিব' এবং একটি সম্পাদিত কাব্যসংকলন 'কাশফুল'। অনেকে অনুরোধ করেছিলেন ছোটোদের জন্যে আরও লিখবার, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মানুষটি লিখতে চান নি। সাক্ষাৎকারে একবার বলেছিলেন, 'জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে আমি কবিতা লিখি না।' হয়তো একারণে তিনি কম প্রচারিত। অনেকগুলো কারণে বহু আলোচিত। যত দিন যাবে সে আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হতে থাকবে। বিশ্বাস করতেন, 'একটা বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে বলে আর কোনদিন মানুষ তার প্রতিবাদী চরিত্র খুঁজে পাবে না, তা হয় না। বিশ্ব ইতিহাস তা বলে না। 'ট্রায়াল এন্ড এরর' পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই মানুষ একদিন সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবে।'

মণিভূষণ লিখতে লিখতে 'পদ্ধতি' কবিতাটি বারবার টোকা মারছে আমার মনে। যে কবিতাটির বোধের সুদূর নিকটে আজীবন তপস্যাভঙ্গিতে বসে থাকা যায়—

'সে একটা বেজায় খামখেয়ালী লোক।
সে লেখে।
তার লেখা ভাবায় এবং জ্বালায়।
যারা জ্বলে, একদিন তারা এসে লোকটার
ডানহাত কেটে নিয়ে চ'লে গেল।
সে বাঁ-হাতে লেখা অভ্যাস করলো।

তারা আবার এলো এবং বাঁ-হাতটা
কেটে দিয়ে গেল।

পাঠকরা এসে বললো, 'তুমি মুখে মুখে বলে দাও,
আমরা লিখে নিচ্ছি।'
সে ব'লে গেল, তারা লিখে চললো।

খবর পেয়ে সরকারী জল্লাদরা এলো—
তার মুখের ভিতর থু থু ছিটিয়ে দিয়ে
দলাপাকানো ন্যাকড়া এবং সিমেন্ট ঢুকিয়ে
মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল।

লোকটা ঈশারায় পাঠকদের বললো—
সমুদ্রতীরে চলো।

সে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে
অন্তহীন বালির উপর লিখে চললো,
পাঠকরা টুকে নিলো।

ডালকুত্তারা আবার নিঃশব্দে এলো এবং
এবার তার দুটো পা-ই কামড়ে খেয়ে নিয়ে
চ'লে গেল।

সে বিশাল সমুদ্রগর্জনের দিকে কান পেতে
একটু হাসলো কারণ—

এতদিনে তার জায়গায় তার চেয়েও বেশি
শক্তিশালী এবং দূরদর্শী
তিনজন লেখক
এসে গেছে।'

মণিভূষণকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে গেলেও দীর্ঘ অনুসরণ দরকার। অন্তর্প্রদেশের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে কয়েনসাইজে মূঢ়তার মতো লিখলাম। তাঁর কবিতার নিহিত অগ্নি ও ইতিহাসের দরজায় রাজহাঁস উড়াল দিচ্ছে। যে রাজহাঁস এখানে অনুচ্চারিত। মনে পড়ছে উনিশশো চুরাশি সালে শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে একটি প্রতিবাদ সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা। আমাকে যেভাবে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধেছিলেন তার উষ্ণতা আজও মর্মকোষে বইছে।

আর আমরা সকলেই জানি, গান্ধীনগরের রাত্রি এখন আরও ভয়ঙ্কর কালো। ❑